Vol. 27 | No. 2 | 1984

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্য

Volume	27
Issue	2
Year	1984
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	রফিকউল্লাহ খান
Published online	April 1, 1984
DOI	10.62328/sp.v27i2.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v27i2.5
Pages	123-138
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

গ্রন্থ-পরিচয়

শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্য ॥ সৈয়দ আলী আহসান। প্রকাশক : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা। প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ১৯৮৩। মূল্য : পঞ্চাশ টাকা। পৃষ্ঠা : ১৮৪

সমাজ ও সভ্যতার বহুশতাব্দীবিস্তৃত ক্রমবিবর্তনের ধারায় শিল্পকলার বিকাশ ও বিচিত্রমুখী অভিযাত্রাকে কোনো সুনির্দিষ্ট পরিণতির সীমায় চিহ্নিত করা যায় না—যদিও আধুনিক শিল্পকলা একটা সামগ্রিক আয়তন নিয়ে বিদ্যমান। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার সাফল্যও পরিণতিস্পর্শী, কিন্তু এই সাফল্যমণ্ডিত পরিণতির মধ্যেও নিহিত রয়েছে অগ্রগতির নিগূঢ় বীজমন্ত্র। কেননা, শিল্পকলা মানবকল্পনার এমন এক ধরনের অভ্যন্তর সৃজনপ্রক্রিয়া (an inner creation of the imagination),[১] যা আবহমান ঐতিহ্য-প্রবাহের অঙ্গীকার সত্ত্বেও প্রগতিচঞ্চল। সুতরাং মানুষের সৃষ্টিশীলতার এই গৌরবোজ্জ্বল প্রান্ত পরিবর্তনশীল ও রূপান্তরপরায়ণ, নির্দিষ্ট কাল বা যুগঅতিক্রান্ত। কিন্তু প্রতিটি যুগঅভিরুচির কাছেই নবতর তাৎপর্য নিয়ে প্রকাশমান, কখনো কখনো এ-কথাও বলা হয় যে, প্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে শিল্পকলার ব্যাখ্যায় সমকালীন দৃষ্টিভঙ্গিই অনিষ্ট।[২] যেমন, মানুষের অবয়বগত সৌন্দর্যসম্পর্কিত ভিক্টোরীয় যুগের ধারণার সাথে অতি-বর্তমান কালের ধারণার পার্থক্যের স্বরূপ নির্দেশ করে বলা হয় : 'Our attitude towards artistic beauty also changes from era to era'।[৩] কোনো শিল্প-বিবেচনার সাম্প্রতিক উদ্যোগকে এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। কারণ, প্রত্যেক যুগেরই শিল্প-বিচার বা শিল্প-আস্বাদনের একটা নিজস্ব অভিরুচি থাকে। সেই সব যুগ-অভিরুচি-প্রবাহের সাথে যুক্ত হয় আমাদের সমকালীন দৃষ্টি ও অনুভবের নতুনত্ব।[৪] সৈয়দ আলী আহসানের 'শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্য' গ্রন্থটি দৃষ্টিভঙ্গি, অনুভব ও বিশ্লেষণ-প্রক্রিয়ার নতুনত্বে বাংলাদেশের শিল্প-বিবেচনার ধারায় একটি মৌলিক সংযোজন। মৌলিক এ-কারণে যে, বাংলাদেশে শিল্প-সৃষ্টির ইতিহাস দীর্ঘদিনের হলেও শিল্পবিচারের যথার্থ মানদণ্ড বিনির্মাণের ক্ষেত্রে একটা মন্থর ও অমনোযোগী পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যায়। এ-বিষয়ে বেশ কিছু গ্রন্থ রচিত হলেও, তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বর্ণনাধর্মী, বিশ্লেষণ-বিমুখ ও খণ্ডিত। বিশ্বশিল্পের ঐতিহ্যধারার সাথে সঙ্গতি রেখে নন্দনতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির যুগপৎ সম্মিলন-প্রচেষ্টা সেখানে দুর্নিরীক্ষ্য। শিক্ষার্থীদের জন্য পরিকল্পিত এ-সকল গ্রন্থে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গুরুত্বপ্রদান করা হয়েছে তার রীতি বা করণকৌশলের [technique] ওপর। এবং আলোচনার চারিত্রও অনেকটা উপস্থাপনমূলক। শিল্পকলাকে সামগ্রিক আয়তনে সংবদ্ধ করে তার সমাজ-নন্দনতাত্ত্বিক ও দার্শনিক ভিত্তির আলোচনা হয়নি বললেই চলে। এ-দিক থেকে আলোচ্য গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে একক ও ব্যতিক্রমধর্মী প্রয়াস।

'শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্য'-কে শিল্পকলার ইতিহাস বা শিল্পের নন্দনতাত্ত্বিক আলোচনামূলক গ্রন্থ হিসেবে চিহ্নিত করা যাবে না। এ-গ্রন্থে শিল্প-ইতিহাসের ক্রমপরম্পরা রক্ষার প্রয়াস যেমন বিদ্যমান, তেমনি নন্দনতাত্ত্বিক বোধ ও উপলব্ধির বিন্যাস ঘটেছে অন্তর্গত প্রাসঙ্গিকতা-সূত্রে। শিল্প-বিবেচনার ক্ষেত্রে আলোচকের কর্ম কেবল নিজস্ব অভিজ্ঞতা, সংবেদ, মনন, অনুভূতি ও বিশ্লেষণ-দক্ষতার বিস্তার সাধন নয়, তাঁকে সমান্তরালভাবে অনুসরণ করতে হয় দর্শক বা পাঠকের সর্বজনীন দৃশ্যগ্রাহ্যতা, আবেগ ও অনুভবক্ষমতার বৈচিত্র্যকেও। এটা কেবল একটা তাত্ত্বিক সীমাংসা নয়, শিল্পকলা বিবেচনার আধুনিক রীতি-প্রক্রিয়া। যেমন, মানুষের প্রতিদিনের দৃশ্যময় প্রকৃতি বা ভাবনার অনুষঙ্গ শিল্পীর চেতনায়-রঙে-রেখায় ভিন্নতর আরেক জগতে পরিণত হয়, তাকে উপলব্ধি বা বিচার করতে হলে দর্শক বা পাঠকেরও চৈতন্যগত উৎকর্ষ প্রয়োজন। সৈয়দ আলী আহসান গ্রন্থসূচনায় "শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্য : ভূমিকা" অংশে উল্লিখিত বিষয়টিকে গুরুত্ব প্রদান করেছেন। ফলে, তার আলোচনা অর্জন করেছে একটা নির্বিশেষ গ্রহণযোগ্যতা।

শিল্পকর্ম আস্বাদনের ক্ষেত্রে মানুষকে প্রথমেই কতকগুলো মৌলিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। শিল্প-উদ্ভবের আদি উৎস থেকে শুরু করে বর্তমানকাল পর্যন্ত তার যে বিচিত্রমুখী অভিযাত্রা, সে-সম্পর্কিত ইতিহাসজ্ঞানের অপূর্ণতা, শিল্প-বিচারের অতীত দৃষ্টিভঙ্গির সাথে আধুনিকতম দৃষ্টিভঙ্গির তুলনাবিচার—প্রভৃতি শিল্প-বিবেচনার ক্ষেত্রে একেকটি সমস্যা হিসেবে বিদ্যমান। শিল্পের করণকৌশলগত দিক (technical side), পরিভাষা, শিল্পীর স্ব-উদ্ভাবিত রীতি-প্রক্রিয়ার অর্থ, সমাজতাত্ত্বিক কার্যকারণ, তার অভিরুচিগত তাৎপর্য বা স্বাতন্ত্র্যও আমাদের অন্বেষার কাছে অনেক ক্ষেত্রে অপরিচয়ের বিস্ময় নিয়ে প্রকাশ পায়। শিল্পীর মৌল-জিজ্ঞাসা ও উপলব্ধির সাথে মানুষের ব্যক্তিগত বিচারক্ষমতার ব্যবধানও কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রবল হয়ে দেখা দেয়। গ্রন্থসূচনায় সৈয়দ আলী আহসান এইসব সমস্যার স্বরূপ-নির্ধারণ ও সমাধান-নির্মাণের প্রয়োজনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন :

> শিল্প সম্পর্কে আমরা অনেক সময় অনেক কথা শুনি। ছবিও আমরা দেখি, ছবির প্রশংসা বিভিন্ন লোকের মুখে শুনতে পাই, আবার ছবিও বুঝতে পারি না এমন কথাও অনেকের মুখে উচ্চারিত হয়। কিন্তু শিল্পকর্ম যথার্থ যে কি, কোন কোন উপাদান দিয়ে চিত্র তৈরী হয় এবং শিল্পী কোন দৃষ্টিতে পৃথিবীকে দেখেন, এটা যারা শিল্প উপভোগ করতে চান তাদের জন্য একান্ত প্রয়োজন।[৩]

এই প্রয়োজনবোধ থেকে লেখকের অভীপ্সা ও অভিনিবেশের বিস্তার কেবল শিল্প-রসজ্ঞের কাছে নয়, সাধারণ শিল্প-অনুরাগী ও সাহিত্য-সংশ্লিষ্ট মন-মননেও সঞ্চারিত হতে বাধ্য।

শিল্পের ক্ষেত্রে সৈয়দ আলী আহসান 'চৈতন্য' শব্দটিকে ইংরেজী "appreciation-এর প্রতিশব্দ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। শিল্প-বিবেচনায় এই শব্দটির সাম্প্রতিক অর্থ হচ্ছে 'creation' (In current usage, 'appreciation' is complementery to creation)[৬], সুতরাং শিল্পচৈতন্য প্রকারান্তরে শিল্পসৃজনেরই সমান্তরাল অনুভূতির দ্যোতক। 'চৈতন্য' শব্দটি এতো ব্যাপক এবং গূঢ়সঞ্চারী যে, জীবনসমগ্রতার অন্তঃসারকে আত্মস্থ করেই তার অস্তিত্ব এবং ব্যঞ্জনা। এই এ্যাপ্রিশিয়েশন বা চৈতন্য এমন এক জটিল কর্মপ্রক্রিয়া—যা শিল্পের বিচিত্র প্রান্তকে এক বিন্দুতে এনে তার মধ্যে সঙ্গতিবিধান করে। ভূমিকাংশে লেখক কেবল এই চৈতন্য-সৃজনের পটভূমিই নির্দেশ করেন নি, গ্রন্থভুক্ত প্রতিটি আলোচনার সারাৎসারকে বিন্যস্ত করেছেন উন্মোচনী সতর্কতায়। একটা স্বতঃস্ফূর্ত ও সতর্ক কাব্যতাত্ত্বিক এবং দার্শনিক বোধ লেখকের সৃজন-প্রেরণার মৌল প্রান্ত হওয়ায়, তাঁর আলোচনা সচেতন কাব্যপাঠক ও সাহিত্যরসজ্ঞের কাছেও আবেদনময় হয়ে উঠতে সক্ষম।

মানুষের দৃষ্টি ও চেতনায় শিল্পকলার গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টির জন্য তার পারিপার্শ্বিক অভিজ্ঞতার সাথে শিল্পসংক্রান্ত মৌলিক অভিজ্ঞানও আবশ্যক। লেখকের সে-সংক্রান্ত সচেতনতা বিশ্লেষণ-প্রক্রিয়ার সরলরৈখিক উন্মোচন থেকে গভীরতর স্বরূপ উদ্‌ঘাটন ও মীমাংসা প্রদানের মধ্যে সুস্পষ্ট। যে-কারণে, পাঠক-অভিজ্ঞতার কাছে পরিচিত একাধিক চিত্রকর্ম উল্লেখ করে তার সুতীক্ষ্ণ ও নিপুণ আলোচনা করেছেন তিনি। মানবীয় শিল্প-জিজ্ঞাসার বিচিত্র প্রান্তকে স্পর্শ করার ফলে, একটা ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গির বিন্যাস ঘটেছে তাঁর আলোচনায়। সভ্যতার আদি থেকে অতি বর্তমানকাল পর্যন্ত যে বিপুল পরিমাণে শিল্পী (চিত্রকর, ভাস্কর, স্থপতি প্রভৃতি) শিল্পচর্চায় আত্মনিয়োগ করেছেন, তার খুব অল্পসংখ্যকই আমাদের অধিগম্য। এই বিচিত্র শৈল্পিক অভিব্যঞ্জনা (expression)-কে সংহত অথচ নিগূঢ় আলোচনায় উন্মোচন করেছেন সৈয়দ আলী আহসান,—যে বিস্ময়কর ও অনুদ্‌ঘাটিত জগতের সম্মুখে দাঁড়িয়ে মানুষ উপলব্ধি করে তার অস্তিত্বের গভীর পটভূমি :

> It is one of the function of the art in human society to help provide and condition the background against which we exist.[৭]

এই শিল্পঅস্তিত্বময় কৌতূহল মানুষের এক মৌলিক প্রবণতা। শিল্প ও তার অগ্রগতির সাথে সাথে পরিবর্তিত হয় মানুষের জিজ্ঞাসা ও অনুভবের রূপ। মানুষের মেধা ও মনন যুগোপযোগী দৃষ্টিকোণ থেকেই বিবেচনা করে শিল্পের স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য। বর্তমান গ্রন্থে তার অঙ্গীকার যেমন বিধৃত, তেমনি আলোচিত হয়েছে : কিভাবে বিভিন্ন জাতি এবং সংস্কৃতি তার শিল্পের প্রগতিসাধন করেছে, মানুষের আবহমান চিন্তায়-অনুভবে-অনুশীলনে কিভাবে সূচিত হয়েছে রূপান্তর ও স্বাতন্ত্র্য এবং কি প্রক্রিয়ায় বিশ্ব-শিল্পপ্রবাহের মধ্যে নির্মিত হয়েছে মানবীয় সৃজনপ্রক্রিয়ার একটা অন্তর্গূঢ় যোগসূত্র।

দুই

শিল্প-আস্বাদন বা বিবেচনার ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে আসে দৃষ্টির প্রসঙ্গ। শিল্পস্রষ্টারও সৃজন-প্রেরণার মৌল-উৎস এই দৃষ্টি। শিল্পী, শিল্প-দর্শক, এমনকি প্রতিটি ব্যক্তির দৃষ্টির মধ্যেই স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান। তবুও এই দৃষ্টিই হচ্ছে শিল্পসৃষ্টির মৌল উপকরণ, তারপর আসে উদ্দীপকের প্রসঙ্গ। কেননা, 'The artist is first and foremost and sensative organism receiving visual and emotional stimuli from the outside world'[৮]। সৈয়দ আলী আহসান তাঁর আলোচনার সূচনাতেই এই তাৎপর্য পর্যালোচনা করেছেন। কেবল শিল্পকলার ক্ষেত্রেই নয়, সামগ্রিক অর্থেই তা মানবীয় জীবনীশক্তির নিয়ামক। "মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ হচ্ছে তার দৃষ্টির বৈভব।"[৯] দৃষ্টি হচ্ছে মানুষের জন্মগত অধিকার, তার ভাষার মতোই---মানবউচ্চারিত ধ্বনিপুঞ্জের মতো। এই ভাষা বা ধ্বনিরও আগে আসে দৃষ্টির প্রশ্ন। কেননা, শিল্পীর কাছে এই দৃষ্টির অধিকার ও তার প্রয়োগ তাৎপর্যপূর্ণ: "শুধু দৃষ্টির অধিকার নিয়েই নয়, দেখার ক্ষমতা নিয়েই নয়, দেখবার বস্তুকে নির্ণয় করা এবং অবশেষে যথার্থ দৃষ্টি দিয়ে দেখা, এটাই হলো শিল্পীর প্রধান কর্ম।"[১০] পৃথিবীকে অনুভব করার রয়েছে আরও নানাবিধ কৌশল। ভূতত্ত্ব, জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত, আপেক্ষিক তত্ত্ব, দর্শন---প্রভৃতি ক্ষেত্রে পৃথিবীকে অনুভব করবার স্বতন্ত্র প্রক্রিয়া বিদ্যমান। কিন্তু "শিল্প হচ্ছে দৃষ্টিগোচরতায় পৃথিবীকে অনুভব করার একটি আবেগময় কৌশল।···শিল্প হচ্ছে ভিন্নতর একটি চৈতন্যভিত্তিক সিদ্ধি, দৃষ্টির সহায়তায় যাকে আমরা ব্যাখ্যা করি এবং দৃষ্টিগত তাৎপর্যে যাকে আমরা মূর্তিমান করি। শিল্পী বিশেষ কৌশলে তার দৃষ্টিনির্ভর অনুভূত সত্যকে রং ও রেখার সাহায্যে চিত্ররূপ দান করেন অথবা ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে মূর্তিময়তায় পর্যবসিত করেন"[১১]। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়: 'Art is the response of man's creative soul to the call of the real.[১২] বস্তুতঃ দৃষ্টির মধ্য দিয়ে শিল্পীসত্তা এই সত্য-অন্বেষায়ই নিয়োজিত।

শিল্পসত্তার উদ্ভব, বিকাশ ও তার ইতিহাস-পরম্পরার উল্লেখ করে শিল্পীর দৃষ্টিতে পৃথিবীর বিচিত্র রূপাভিব্যক্তির স্বরূপসত্যকে উন্মোচন করেছেন লেখক। 'দৃষ্টিগত অনুভূতির···'বিচিত্র স্বরগ্রাম' এই সংহত ও নিগূঢ় বাক্যবন্ধনে যেন স্পন্দিত হয়ে উঠেছে শিল্পচেতনার সেই চিরায়ত অভিনিবেশ—যা একদা বিচিত্র লীলাছন্দে আন্দোলিত করেছিলো ক্লাইভ বেল-এর দৃষ্টি এবং অনুভূতিকেও:

> For my part, I am not so much better off at a concert than the Colonel is in a picture gallery. The adventitious beauties, or some of them, I enjoy, a melody here, a harmony here; but as for grasping an intrieate and unfamiliar piece of music as a whole, disentangling the parts, and realizing each in itself and in retiation to the rest. That I cannot do.[১৩]

এভাবেই মানবসত্তার বিকাশ, তার ক্রমায়ত শিল্পদৃষ্টি ও অনুভূতিপুঞ্জের সাথে অন্তর্গত যোগসূত্র রক্ষার প্রয়াস গ্রন্থভুক্ত আলোচনায় বিধৃত।

শিল্পবোধের ক্ষেত্রে হারবার্ট রীড্ ব্যবহৃত Perception ও Expression—শব্দ দুটোর আলোচনা প্রসঙ্গে শিল্পীর জাগ্রত বস্তুজারিত চৈতন্য ও তার অভিব্যক্তির অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন লেখক। মানুষের 'অপটিক্যাল দৃষ্টি' কি প্রক্রিয়ায় শিল্পীচৈতন্যে ভিন্নতর অবয়ব অর্জন করে, একটি বস্তুর উপকরণগত ক্ষয়শীল বাস্তবতাকে কিভাবে 'অনুভূতির অন্তঃসার' দিয়ে জীবন্ত করে তোলেন শিল্পী—প্লেটো-এ্যারিস্টটল উদ্ভাবিত বিতর্কিত দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা করে তার একটি মীমাংসা নির্দেশ করেছেন সৈয়দ আলী আহসান। এ-থেকে তাঁর শিল্পের দার্শনিক ভিত্তি সম্পর্কিত সুগভীর অভিজ্ঞান হয়ে উঠেছে সুস্পষ্ট। সজীব, সচল ও প্রাণবন্ত ভাষায় তিনি বস্তুসত্তার স্বরূপ ও শিল্পীর কাছে তার গ্রহণযোগ্যতার প্রকৃতি নির্দেশ করেছেন:

> বস্তুর একটি সত্তা আছে যে সত্তা তার বস্তুগত অস্তিত্ব। কবি এবং শিল্পীর দৃষ্টিতে বস্তুর বস্তুত্বটি কিছুই নয় কিন্তু তার সজীবতা এবং সচলতাই একমাত্র প্রতিপাদ্য। বাতাসে কম্পমান প্রভূত পত্রে সমৃদ্ধ একটি গাছের শাখায় যখন সূর্যের আলো এসে পড়ে তখন শিল্পী স্থির একটি শাখাকে দেখেন না, তিনি আলোর কম্পনে সজীব অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন।··· বস্তু হচ্ছে শিল্পীর উপলক্ষ্য, বস্তু তার প্রতিপাদ্য নয়।··· বস্তুর মধ্যে অনুভূতিকে যুক্ত করে একজন শিল্পী তার শিল্পকর্মের ভিত্তি স্থাপন করেন।[১৪]

সাম্প্রতিক শিক্ষানবীশ শিল্পী এবং পাঠকচৈতন্যের প্রতি ঐকান্তিকতা বশতঃ সৈয়দ আলী আহসান চিত্রকলার তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক দিকগুলোর সুবিস্তৃত আলোচনা করেছেন। উদাহরণ সহযোগে বিশ্লেষণ করে শিল্পউপলব্ধির মৌলিক অনুষঙ্গ থেকে শুরু করে তার সমগ্রতাকে স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছেন তিনি। শিল্পকর্মে বিভিন্ন আঙ্গিকে ব্যবহৃত উপকরণের (যেমন—রেখা, রঙ, ক্যানভাস, স্পেস প্রভৃতি) আলোচনায় তাঁর অভিনিবেশ আদিম গুহাচিত্র থেকে শুরু করে অতিসাম্প্রতিককালের শিল্পপ্রয়াস পর্যন্ত বিস্তৃত। রেখার তাৎপর্য, প্রতিটি রঙ-এর স্বতন্ত্র অভিব্যঞ্জনা, বিভাজন এবং রঙ-এর উজ্জ্বলতা, আভা ও ঘনত্বের প্রকারভেদ—প্রভৃতিকে দৃষ্টান্ত সহযোগে সূক্ষ্মভাবে উপস্থাপন করেছেন লেখক। এ-সকল ক্ষেত্রে তাঁর অনুভব ও উপলব্ধি একটা নির্বিশেষ ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। তাঁর বিশ্লেষণ-প্রক্রিয়ার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত:

> ভ্যান গগের একটা ছবি আছে, সেল্ফ পোর্ট্রেট, সে ছবিটা সম্পূর্ণ নীল, পোশাক নীল, মুখটা লাল। এই সেল্ফ পোর্ট্রেটের সাহায্যে তিনি আমাদের কাছ থেকে দূরে অবস্থান করছেন এবং তিনি একাকী। এই রং-এর মধ্য দিয়ে শিল্পী তার একাকিত্বকে, তার নির্জনতাকে আশ্চর্য মমতার সঙ্গে, আশ্চর্য কুশলতার সঙ্গে প্রকাশ করেছেন। পিকাসোর একটা সময় গিয়েছে, ব্লু পিরিয়ড বলা হয়, তখন এই নীল রং-এর ব্যবহারের একটি প্রচণ্ডতা এবং অনিবার্যতা ছিল।[১৫]

শিল্প যেহেতু শিল্পীর চৈতন্যের রূপায়ণ, সেজন্য প্রতিটি যুগের অন্তঃসার যেমন নির্দিষ্ট কালের শিল্পে প্রতিফলিত হয়, তেমনি প্রতিটি শিল্পীরও চৈতন্যগত স্বাতন্ত্র্য অভিব্যক্ত হয় তাঁদের শিল্পকর্মে। আধুনিক কালের শিল্পীরা তাঁদের দৃষ্টির তাৎপর্য ও অনুভবের স্বাতন্ত্র্যকে প্রকাশ করেছেন বিচিত্র প্রক্রিয়ায়। যার ফলে, শিল্প হয়ে উঠেছে জটিল ও বহুবিচিত্র : "কারো দৃষ্টিতে সকল বস্তু আলোর অসংখ্য বিচূর্ণ রং-এর মধ্যে প্রবহমান, কারো দৃষ্টিতে কোণ (cone) বা শঙ্কুসদৃশ দৃষ্টির একাগ্রতায় অজস্র বিভাজ্য অংশের সমাহারে একটি চিত্র জাগ্রত হচ্ছে, কেউ আবার চেয়েছেন মানুষের অবদমিত ক্ষোভ, ইচ্ছা এবং বিফলতাকে রূপ দিতে। এভাবে আধুনিক চিত্রকলার ব্যাখ্যায় বহু শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন কিউবিজ্‌ম্ (cubism), বিন্দুবাদ বা পইন্টিলিজম (pointilism), প্রকাশবাদ বা এক্সপ্রেশনিজম (expressionism)।"[১৬] এই বিচিত্র অনুভূতি, দৃষ্টির তাৎপর্য, রেখায়ণ বা রঙ-এর অভিব্যক্তি সম্পর্কে কাম্যবোধ জাগ্রত করা লেখকের অন্বিষ্ট। সে-কারণে বিচিত্র উপকরণের সমন্বিত বিন্যাসে সৃষ্ট সংবেদনকে তিনি সামগ্রিক অনুভবের অনুষঙ্গে পরিণত করতে সচেষ্ট। এই সমন্বয়বোধ সম্পর্কে হারবার্ট রীডের উক্তিটি স্মরণযোগ্য : "The structure of a work of art, is not always obvious ; it may be a subtle balance of irregularly disposed units।"[১৭] সৈয়দ আলী আহসানের ভাষায় : "শিল্পগত সৌন্দর্যের মূল্য শুধুমাত্র উপকরণসঞ্জাত নয়। তা একই সঙ্গে উপকরণের, গঠনসৌষ্ঠবের এবং বিষয়গত প্রকাশময়তার।"[১৮]

তিন

উন্মোচনী ভূমিকাংশ—যার মধ্যে শিল্পকলার সমগ্র প্রান্তের স্পন্দন বিদ্যমান—ছাড়াও এ-গ্রন্থে আরও সতেরোটি প্রবন্ধ বিন্যস্ত হয়েছে। শিরোনামাগুলো থেকে গ্রন্থচারিত্র্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন সম্ভব। যেমন, 'প্রাগৈতিহাসিক যুগের শিল্প-চৈতন্য,' 'শিল্পকর্মে দৃষ্টিচেতনা', 'বিমূর্ত শিল্পকর্ম', 'চিত্রকর্মে রং-এর ব্যঞ্জনা এবং রূপপ্রতিপত্তি', 'লিওনার্দো দা ভিঞ্চি', 'মাইকেল এঞ্জেলো', 'বিহ্‌যাদ', 'পল ক্লী', 'পিকাসো', 'স্থাপত্য শিল্প', 'ভাস্কর্য', 'চীন ও জাপানের চিত্রাঙ্কণ পদ্ধতি', 'ইসলামী শিল্পকলা', 'ভারতীয় শিল্পকলা', 'অপ্রধান শিল্প', 'বাংলাদেশের শিল্পকলা', এবং 'আধুনিক শিল্প : কয়েকটি সংজ্ঞা'। শিল্পকলার আদি-উৎস থেকে শুরু করে তার সাম্প্রতিকতা পর্যন্ত প্রসারিত এ-সকল আলোচনার গতি ঠিক ঐতিহাসিক কালপরম্পরা রক্ষা করেনি, তবে শিল্প-চৈতন্যের বিবর্তনের প্রতিটি পর্যায় লেখকের বৈচিত্র্যপ্রিয় ও সুতীক্ষ্ণ অভিনিবেশের ফলে হয়ে উঠেছে সুস্পষ্ট।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের (pre-historic age) যে-সব চিত্রকর্ম আবিষ্কৃত হয়েছে, তার চারিত্রধর্ম ও শিল্প-চৈতন্য কেবল নন্দনতাত্ত্বিক অনুভবের মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করা যায় না, সেখানে নৃতাত্ত্বিক-সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধিৎসা ও অভিনিবেশের প্রয়োগও অপরিহার্য। সে-কারণে দেখা যায়, আদি-মানবের সৃজিত যে-সকল টানা টানা রেখায় অঙ্কিত চিত্র

প্রাচীন গুহাগাত্রে আবিষ্কৃত হয়েছে, সেখানে চিত্রকর্ম হচ্ছে "অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কৌশল, অনুশীলন ও সংগ্রাম হচ্ছে সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া।"[১৯] এভাবেই আদিম মানবের চিত্রকর্ম হয়ে উঠেছে অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রামের বহিঃপ্রকাশ। তখন আবিষ্কৃত হয়নি ভাষা, নিজেকে সামগ্রিকভাবে প্রকাশ করার সামাজিক প্রেরণাও হয়নি সৃজিত, যার ফলে, অনুভব অপেক্ষা দৃষ্টির ভূমিকাই সেখানে মুখ্য। বন্যজন্তু শিকার তাদের জীবিকা এবং আত্মরক্ষার অভিন্ন কারণ ছিলো বলে, আদিম মানবের শিল্পকর্মের বিষয় তাদের জীবনাচরণ, সংস্কার ও সংগ্রামের সাথে অঙ্গাঙ্গি। কেননা, "For primitive man artistic creation meant an an escape from the arbitrariness of life. He lived from day to day, and from hand to mouth in the exact meaning of the phrases. There was no permanency in his life, no sense of duration."[২০]। তাই তাদের শিল্প আকস্মিক বা অব্যবহিত ঘটনার প্রতিক্রিয়া বা প্রতিফলন নয়, পক্ষান্তরে তা ঘটনা-নির্মাণের প্রতিক্রিয়া, অস্তিত্বসংগ্রামের শৈল্পিক অভিব্যক্তি। সৈয়দ আলী আহসান এ-পর্যায়ের শিল্পচৈতন্যকে নতুন তাৎপর্যে আভাসিত করেছেন। প্রাচীন শিল্প-প্রেরণার কারণ, তার উপাদান, আঙ্গিককৌশল—প্রভৃতিকে বিশ্লেষণ করেছেন নিজস্ব প্রক্রিয়ায় :

> প্রাচীন গুহাগাত্রে টানা টানা রেখাঙ্কন আছে আবার মানুষের হাতের সুস্পষ্ট ছাপও আছে। আমরা জানি ভালুক তার নখকে ধারালো করবার জন্যে গাছের গায়ে অথবা দেয়ালে আঁচড় কাটে। অতীতে মানুষ তাদের শিল্পকর্মের সূত্রপাতে প্রাণীর আঁচড়ের অনুকরণ করেছে—অথবা নিজেদের হাতের রেখা-প্রতিলিপি এঁকেছে গুহার দেয়ালে। উদ্দেশ্য ছিলো নিজের ক্ষমতাকে আবিষ্কার করা অথবা বলা যায় আপন শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া। শিল্পকর্মে তাদের হাতই শুধু সক্রিয় ছিলোনা হাতের প্রক্রিয়ায় মনোনিবেশও এসেছিলো।
>
> ...দৃষ্টি ছিলো সে-কালের শিল্পীদের প্রধান সহায়, কেননা শিকারের অন্বেষণে দৃষ্টিকেই একাগ্র, সূচীসূক্ষ্ম এবং নিশ্চিন্ত করতে হয়। তারা তাদের দৃষ্টির পূর্ণ আয়ত্তে এনেছিলো প্রাণীদেহের আকৃতির বিভিন্ন অংশভাগ এবং সমগ্রতা এবং দেয়াল গাত্রে তাদের গতিসক্রিয় চৈতন্যকে সুচিহ্নিত করেছিলো। এরা পৃথিবীতে মুর‍্যাল বা প্রাচীর গাত্রাঙ্কিত চিত্রকর্মের উদ্ভাবক।[২১]

এভাবেই ক্রমানুয়ে আদি প্রস্তর যুগ (Palaeolithic Age), মধ্যবর্তী প্রস্তর যুগ (Mesolithic Age) এবং নব্য প্রস্তর যুগের (Neolithic Age) শিল্পকর্মের চৈতন্যগত ও বৈশিষ্ট্যগত দিকের নিগূঢ় আলোচনা করেছেন লেখক। আধুনিক স্থাপত্য শিল্পের ভিত্তিও যে এই প্রাচীন শিল্পকর্মের মধ্য দিয়েই স্থাপিত হয়েছিলো অলক্ষ্যে, নব্য প্রস্তর যুগের শিল্পকর্ম আলোচনায় তার উল্লেখ করেছেন তিনি।

'অভিচার সম্মোহনের নির্দেশেই হোক বা কর্মপোষকতার সমর্থনেই হোক বা উৎসবের স্মৃতিকে বহমান রাখবার জন্যই হোক' তাঁর বিবেচনায় (হারবার্ট রীড-ও এ-মত পোষণ করেন) 'আদিযুগ থেকেই পৃথিবীতে শিল্পের উদ্ভব হয়েছে।' এবং ''জীবনকে স্পর্শ করেই শিল্পের উন্মোচন। জীবনের প্রাত্যহিকতাকে আনন্দিত রাখবার জন্যই শিল্পের বিকাশ, জীবনের আশ্লেষ এবং বিচিত্র ব্যঞ্জনাকে কেন্দ্র করেই ক্রমাগত শিল্পরীতির বিবর্তন।''[২২]

সৈয়দ আলী আহসানের মৌল প্রবণতাই হলো শিল্পকে চৈতন্যগত পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করা। অবশ্য এই চৈতন্য জীবনসমগ্রতারই একটা সমন্বিত উপলব্ধির দ্যোতক। তাঁর ''শিল্পকর্মে দৃষ্টিচেতনা'' আলোচনাটিতে শিল্পের বিভিন্ন আঙ্গিকে (যেমন, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য ইত্যাদি) প্রতিফলিত শিল্পীর দৃষ্টিগত তাৎপর্যের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ ফরাসী শিল্পী মাতিসের রাজহাঁসের বিশ্লেষণ প্রক্রিয়াটি উল্লেখ্য—যেখানে দৃষ্টিগত ঐশ্বর্যের অনুপুঙ্খতায় মাতিসের রাজহাঁস পাঠকের দৃষ্টি ও চেতনায় হয়ে ওঠে জীবন্ত। দৃষ্টির দ্বিমাত্রিক প্রতিক্রিয়ার বিশ্লেষণটি প্রকৃত অর্থেই লেখকের অভিনিবেশগত স্বাতন্ত্র্যের উজ্জ্বল পরিচয় বহন করে :

> দৃষ্টিগ্রাহ্য বস্তু কোনও শিল্পীর মনে আত্মগত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, আবার কারও মনে সৃষ্টি করে বস্তুগত প্রতিক্রিয়া। আত্মগত প্রতিক্রিয়ায় আনন্দ অথবা নিরানন্দ, বিস্ময় অথবা হতাশা পরিচিহ্নিত হয়, অন্যপক্ষে বস্তুগত প্রতিক্রিয়ায় বস্তুর রূপরেখার প্রতিচিত্রণ ধরা পড়ে। ··· শিল্প হচ্ছে দৃষ্টি সম্পর্কে অবগতি, 'ফর্ম' বা অবয়ব সম্পর্কিত রীতি-প্রকরণ এবং বিশুদ্ধ দৃষ্টি-চেতনা।[২৩]

শিল্পীর দৃষ্টিচেতনার মধ্যেই নিহিত রয়েছে সভ্যতা ও শিল্পের বিবর্তনের গতিপরম্পরা। কেননা, 'The development of art in any civilization can be related to the development of vision'[২৪]।

শিল্পকলায় বিমূর্ততার সর্বময় আধিপত্য আধুনিককালের ঘটনা। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকেই 'বিমূর্ত' শিল্প, (Abstract Art) একটা আন্দোলনে পরিণত হয়—যদিও বলা হয় 'সমস্ত শিল্পই প্রাথমিকভাবে বিমূর্ত।'[২৫] আধুনিক জীবনজটিলতার বহুমাত্রিক বিস্তার শিল্পীচৈতন্যে যে অন্তর্প্লবের সূচনা করেছে, তার ফলে, এই জল-কোলাহলময় বস্তুবিশ্ব থেকে শিল্পী আশ্রয় খুঁজেছে করণ-কৌশলের নব্যউদ্ভাবনার জগতে।[২৬] বিশশতকীয় জীবনপ্রবাহে বহির্বাস্তব যেভাবে বহুভঙ্গিম, দ্বন্দ্বময় জটিল ও রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে, তার অভিঘাতে শিল্পীচৈতন্যে প্রথাগত আঙ্গিক হয়ে পড়েছে গৌণ। সৈয়দ আলী আহসান বিমূর্ত শিল্পকলার অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণে এটাই প্রমাণ করেছেন যে, বস্তু অপেক্ষা যেখানে তার অন্তর্গত শক্তি মুখ্য হয়ে ওঠে শিল্পী-চেতনায়, তখনই বিমূর্ত শিল্পের উদ্ভব। ''বস্তুর প্রতিনিধিত্বগত অর্থ ছাড়া যে চিত্র বা ভাস্কর্য গড়ে ওঠে, এবং যার মধ্যে স্পষ্ট দৃশ্যগতভাবে কোনও বস্তুর সমতা বা স্বাভাবিক গঠনকে নির্ণয়

করা যায় না তাকে আমরা বিমূর্ত শিল্প বলতে পারি।"[২৭] শিল্পের বিমূর্ততার আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি রোম্যান্টিক কবিতার যে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন, তাতে তাঁর আলোচনা অর্জন করেছে অন্যতর তাৎপর্য। প্রকৃতপক্ষে তাঁর চেতনায় শিল্পকলা একটা সামগ্রিক অবয়ব নিয়ে বিদ্যমান। শিল্পে পরিপ্রেক্ষিতের ব্যবহার আলোচনা করতে গিয়ে তিনি অন্যত্র গ্রীক ট্রাজেডির যে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন, সেখানেও তাঁর সমগ্রতাস্পর্শী অনুসন্ধিৎসা বিদ্যমান। যেমন, "গ্রীক ট্রাজেডিতে পূর্ব-নির্ধারিত বিশ্ব-বিধানের গতিধারার উন্মোচনের মধ্যে যেমন নাটকের সকল সত্তা নির্ভরশীল ছিলো, তেমনি রেনেসাঁযুগের শিল্পের জন্য ছিলো পরিপ্রেক্ষিতগত কৌশল।"[২৮] শিল্পের বিমূর্ততা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন: "রোমান্টিক কাব্যকর্মে যেমন কোনও বস্তু একান্ত উদ্দিষ্ট হয় না কিন্তু ভাব উদ্ভাবনার সহায়ক হয়—যে ভাবটি হচ্ছে কবিতার বিষয়, তেমনি আধুনিক চিত্রকর্মে বস্তুগত উপকরণ হচ্ছে শিল্পগত সমস্যা নির্ণয় এবং সেখানে শিল্পগত সমস্যাই হচ্ছে চিত্রকর্মের বিষয়।"[২৯] আসলে যে-কোনো মহৎ শিল্পসৃষ্টির পেছনেই বিমূর্ততাবোধ মৌল প্রেরণা-উৎস হিসেবে বিদ্যমান। যেহেতু বাস্তবতার সরল উন্মোচন শিল্পীর অনিষ্ট নয়, চৈতন্যের বিচিত্র প্রতিক্রিয়া ও ব্যঞ্জনাকে রঙে-রেখায়-তুলিতে প্রতিফলিত করা তার কাজ, সেখানে বিমূর্ততার চেতনা প্রতিনিয়তই তার শিল্পপ্রেরণার অনুষঙ্গী।

আধুনিক কালে একাডেমিক ও প্রথাগত শিল্পচর্চার বিরুদ্ধে বিমূর্ততা যে আধিপত্য বিস্তার করেছে চিত্রকলায় ও ভাস্কর্যে, সেখানে বিশুদ্ধ ফর্ম—হারবার্ট রীড যাকে বলেছেন Pure form—বলতে কিছু নেই। "১৯১০ সাল থেকে কানদিনস্কি এবং ১৯১৭ সালের পর মন্‌দ্রিয়ান আধুনিক চিত্রকলায় অবিমিশ্র বিমূর্ত রীতির উদ্ভাবনা করেন।"[৩০] এবং ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ বিমূর্ততার উন্নতি সাধন করেন বারবারা হেপওয়ার্থ।[৩১] আধুনিক স্থাপত্যশিল্পেও মন্‌দ্রিয়ান উদ্ভাবিত জ্যামিতিক সংবদ্ধতা প্রভাব বিস্তার করেছে। সৈয়দ আলী আহসান তাঁর আলোচনায় বিমূর্ত শিল্পের সমগ্র প্রান্তকেই স্পর্শ করেছেন। বিমূর্ত চিত্রকর্মের স্বরূপ সম্পর্কে তিনি বলেছেন: "বিমূর্ত চিত্রকর্মে বহির্বিশ্বের রূপধর্ম বিচূর্ণিত হয় এবং বিষয়ের তাৎপর্য ধরা পড়ে শুধুমাত্র তার রং এবং গঠনস্বরূপের আবেদনের মধ্যে। শিল্পী তার বিমূর্ত চিত্রকর্মকে দৃশ্যমান বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন করেন।"[৩২] কিন্তু বস্তুসত্তার অনিবার্যতাকে শিল্পকর্মে অস্বীকার করা অসম্ভব। কেননা, বিমূর্ততারও একটা সমাজতাত্ত্বিক তাৎপর্য আছে, 'Mondrian was equally insisted on the social significance and 'realism.' of his 'pure' plastic art।'[৩৩] সৈয়দ আলী আহসানের ভাষায় মন্‌দ্রিয়ান "বস্তুকে শুধু চিহ্নে এবং বর্ণে রূপান্তরিত করলেন। তাঁর বিবেচনায় সতত পরিবর্তনশীল বস্তুসত্তার পিছনে একটি অবিচ্ছিন্ন এবং অখণ্ড বাস্তব আছে। ···নির্দিষ্ট বস্তুবাদ এবং আকস্মিকতা পরিহার করবার আপ্রাণ চেষ্টায় মন্‌দ্রিয়ানের সফলতা বিস্ময়কর।"[৩৪] শিল্পকলার এই নব্যবাস্তবতা আধুনিক চিত্রকর্মের বিস্ময়কর অগ্রগতির পরিচয়বাহী। লেখক বিমূর্ত চিত্রকর্মের উদ্ভব, বিকাশ এবং তার বর্তমান অগ্রযাত্রার স্বরূপ নির্দেশ করে পাঠক-অভিজ্ঞতা এবং কৌতূহলের কাছে এর আবেদনকে করে তুলেছেন তাৎপর্যবহ ও দূরসঞ্চারী:

বিমূর্ত শিল্পপদ্ধতি দু'টি ধারায় প্রবাহিত এবং বর্তমান মুহূর্ত পর্যন্ত জাগ্রত। একটির উৎসমূলে কান্দিন্স্কির শিল্পকর্ম যাকে আমরা গতিধর্মী বলতে পারি, অন্যটির উৎস মূলে মন্দ্রিয়ানের শিল্পকর্ম যাকে আমরা জ্যামিতিক বিমূর্ততা বলতে পারি। বিমূর্ততার মধ্য দিয়ে একটি সত্যকে আবিষ্কার করবার চেষ্টা এখন পর্যন্ত চলছে—কখনো রং-এর গীতিময় বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে, কখনো নিরঙ্কুশ বুদ্ধিবাদী জ্যামিতিক রেখাঙ্কনের মধ্য দিয়ে।[৩৫]

কিন্তু লেখকের সমগ্রতাস্পর্শী চৈতন্য কেবল চিত্রকর্ম এবং ভাস্কর্যের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে না, শিল্পের অন্যান্য উৎস থেকে দৃষ্টান্ত আহরণ করে: "কবিতায় যেমন মৌলিক বাগধারা নির্মাণের প্রয়োজন হয় উপলব্ধির সফলতাকে উচ্চারণ করবার জন্য, শিল্পকর্মেও পিয়েৎ মন্দ্রিয়ান এবং কান্দিনস্কি এক বিমূর্ত সত্যকে রূপ দেবার জন্য নতুন এবং মৌলিক শিল্পকর্মের জন্ম দিলেন।"[৩৬] 'রঙ' (Colour) চিত্রকলার এক অন্যতম প্রধান উপাদান।[৩৭] রঙ-এর প্রতিক্রিয়া এবং তার অভিব্যঞ্জনা শিল্পীচৈতন্যের অনিবার্য অনুষঙ্গ—আলো এবং অন্ধকার বা দিন ও রাত্রির মতো। যে-কারণে, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, কবি, শিল্পী—সকলের চৈতন্যে এবং সৃষ্টিতে রঙ-এর প্রতিপত্তি অপরিসীম। সৈয়দ আলী আহসান "চিত্রকর্মে রং-এর ব্যঞ্জনা এবং রঙপ্রতিপত্তি" আলোচনায় শিল্পকলায় রঙব্যবহার বৈচিত্র্যের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন। রঙসম্পর্কিত নিউটনিক পরীক্ষা থেকে শুরু করে শিল্পকলার বিভিন্ন আঙ্গিকে রঙ-এর বিন্যাসপ্রক্রিয়ার বিস্তৃত আলোচনা করেছেন তিনি। শিল্পকলায় রঙ যেন একটা গতিময় অস্তিত্ব, সর্বময় চৈতন্যের অভিব্যঞ্জনাজ্ঞাপক শক্তি। সভ্যতা ও শিল্পের পরিবর্তনের সাথে সাথে শিল্পীচৈতন্যেও রঙ প্রতিনিয়ত নব নব তাৎপর্য নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। রঙ-ব্যবহারের মধ্যে শিল্পীর স্বাতন্ত্র্যও অনেকাংশে নির্ভরশীল। রঙ-এর প্রয়োগ, তার বিভাজন, ঘনত্ব ও ঔজ্জ্বল্যের তারতম্য শিল্পচর্চার বিভিন্ন পর্যায়ে রঙ-ব্যবহারের স্বরূপ ও তাৎপর্য—প্রভৃতিকে তিনি নিপুণভাবে আলোচনা করেছেন। "আমাদের বিভিন্ন অনুভূতিকে আমরা কবিতায় উপমা-রূপকের সাহায্যে প্রকাশ করে থাকি, তেমনি চিত্রকর্মে প্রকাশ করে থাকি রং-এর সাহায্যে। প্রশান্তির বোধ, ত্যাগের, আনন্দের, উষ্ণতার অথবা শীতলতার বোধ রং-এর সাহায্যে প্রকাশ করা হয়ে থাকে।"[৩৮] এভাবে লেখক-চিত্রকলায় রঙ-ব্যবহারের বিবর্তন উন্মোচনের মধ্য দিয়ে তার সমগ্রতাকে স্পর্শ করেছেন। দৃষ্টি যেমন শিল্পের ক্রমবিবর্তনের প্রধান মানদণ্ড, রঙও তেমনি সেই বিবর্তনধারার বিভিন্ন পর্যায়ের শিল্পীচৈতন্যের অভিব্যক্তিজ্ঞাপক শক্তি।

চার

রেনেসাঁ যুগের শিল্পকলা থেকে শুরু করে বর্তমান শতকের বৈচিত্র্যময় ও বিস্ময়কর শিল্প-চর্চার গতি-প্রকৃতির পরিচয় বিধৃত হয়েছে পরবর্তী পাঁচটি আলোচনায়। যুগ-প্রতিনিধিত্বকারী শিল্পীব্যক্তির রেনেসাঁ যুগের "লিওনার্দো দা ভিঞ্চি" ও "মাইকেল

এঞ্জেলো", পঞ্চদশ শতকের ব্যতিক্রমধর্মী ইরানী শিল্পী "বিহ্‌যাদ" এবং আধুনিককালের দুই অসাধারণ ব্যক্তিত্ব "পল ক্লী" এবং "পাবলো পিকসো"। কিন্তু বিস্ময়কর এই যে, অঁরি মাতিস লেখকের সামগ্রিক বিবেচনার একটি প্রিয়-প্রসঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও সে-সম্পর্কিত কোনো স্বতন্ত্র প্রবন্ধ এ-গ্রন্থে অনুপস্থিত। অবশ্য একমাত্র 'বিহ্‌যাদ' ব্যতীত গ্রন্থের বিভিন্ন আলোচনায় শিল্পকলার ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি-বর্গের উপস্থিতি বিদ্যমান।

বিহ্‌যাদ-বিষয়ক আলোচনাটি প্রাচ্য চিত্রকলার এক অনুদ্‌ঘাটিত জগতের উন্মোচন। বাংলাভাষী পাঠকের কাছে অভিজ্ঞতা ও শিল্পের ইতিহাস পরম্পরা সম্পর্কে সামগ্রিক জ্ঞান অর্জনের পটভূমিতে এ-আলোচনার কার্যকারিতা অপরিসীম। বিহ্‌যাদের জীবন ও শিল্পচর্চার পটভূমি আলোচনা করে লেখক তাঁর স্বাতন্ত্র্য ও সাফল্যের স্বরূপ নির্দেশ করেছেন: "বিহ্‌যাদের চিত্রকর্মে রং এবং রেখার ব্যবহারের একটি পেলব সৌকুমার্য এবং সূক্ষ্ম কারুকার্য আছে—যার সঙ্গে য়ুরোপের রেনেসাঁর চিত্রকর্মের কোন সাদৃশ্য নেই। বিহ্‌যাদ একটি রোমান্টিক ভাবাবহ, প্রশান্তির নির্জনতা এবং কাব্যগত ছন্দের মধুরতা নির্মাণ করেছিলেন। দেহগত এবং বস্তুগত রূপকল্প তিনি আত্মার উপলব্ধিকে প্রকাশ করেছিলেন।"[৩৯]

পাঁচ

স্থাপত্য (Architecture) উদ্ভবলগ্ন থেকেই একটা স্বতন্ত্র শিল্পবৈশিষ্ট্য নিয়ে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আমাদের জীবনে ও চৈতন্যে তার শিল্পগত দিকের প্রাসঙ্গিকতা এখনো সর্বাঙ্গীন প্রতিষ্ঠা অর্জন করেনি। এদিক থেকে "স্থাপত্যশিল্প" আলোচনাটির গুরুত্ব অপরিসীম। বাঙালির ব্যবহারিক জীবনে এর কার্যকারিতার প্রসঙ্গটিও বলতে গেলে অবহেলিত রয়ে গেছে। কিন্তু, Of all the arts, architecture has the most social direction and economic basis. However beautiful its final impact on us, its basic objective is utility, it is mode to serve concrete perpose for an individual or a community'[৪০]।

বর্তমান গ্রন্থে সংক্ষিপ্ত পরিসরে হলেও স্থাপত্য শিল্পের ইতিহাস-পরম্পরার আলোচনার অনুষঙ্গে তার গঠনগত ও অন্যান্য দিকেরও বিশ্লেষণ করেছেন লেখক। স্থাপত্যশিল্পকে আমাদের জীবনযাপন প্রণালির অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করা তেমন দুরূহ ব্যাপার নয়। এ-প্রসঙ্গে লেখকের বিবেচনা অনুভবসঞ্চারী:

> চিত্রকর্ম, ভাস্কর্য এবং স্থাপত্যের মধ্যে প্রথম দুটি জীবন-যাপনের কর্ম-প্রণালীর সংগে যুক্ত নয়, কিন্তু স্থাপত্যশিল্প মানুষের আশ্রয়ের মৌলিক প্রয়োজনে গড়ে উঠেছে। জীবনধারণের জন্য যেমন খাদ্য প্রয়োজন, আশ্রয়ের জন্য তেমন গৃহ, সুতরাং স্থাপত্যের শিল্পগত সিদ্ধতা অংশত তার প্রয়োজনের উপর নির্ভরশীল।[৪১]

মানুষের প্রয়োজনবোধের সাথে যদি শিল্পচেতনার সুষম সমন্বয় সাধিত হয়, তাহ'লে তার পারিপার্শ্বিকতাও হয়ে উঠতে পারে শিল্পগুণ-মণ্ডিত। বাংলাদেশে নগরায়ণের বিস্তৃতি ও সম্ভাবনাকে শিল্পসুষমাময় করে তুলতে হলে তার স্থাপত্যের প্রতিও শৈল্পিক অভিনিবেশ প্রযুক্ত করা আবশ্যক।

মানুষের প্রয়োজননিহিত জীবনাচরণের সাথে ভাস্কর্য-এর তেমন সম্পর্ক নেই সত্যি, কিন্তু মানবীয় অনুভূতি ও কল্পনার অভিব্যক্তিকে ধারণ করে এই শিল্পআঙ্গিকের ইতিহাস গৌরবময়। মানুষের ধর্মবিশ্বাসের সাথে যখন ভাস্কর্যের যোগসূত্র সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, তখন মানবজীবনের মৌলিক সংস্কারের অনুষঙ্গে পরিণত হয় ভাস্কর্য। গ্রন্থভুক্ত "ভাস্কর্য" আলোচনাটি লেখকের সুগভীর অভিনিবেশ ও বিশ্লেষণনৈপুণ্যে অনেক অজ্ঞাত সত্যের উন্মোচক। মানুষের আদিম শিল্পপ্রেরণা থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত ভাস্কর্য-শিল্পের বিবর্তন ও প্রগতির প্রতিটি পর্যায়কেই উন্মোচন করেছেন তিনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তীকালে এই শিল্পপ্রক্রিয়ার অগ্রগতি সম্পর্কে সৈয়দ আলী আহসানের অনুসন্ধিৎসা গভীর অভিনিবেশ ও প্রযুক্তিজ্ঞানের স্বাক্ষর বহন করে:

> দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর শিল্পকর্মে বিশেষ করে ভাস্কর্যে নতুন নতুন উদ্ভাবনার সূত্রপাত হল, পরিচিত এবং বহুল ব্যবহৃত মিডিয়া বা উপকরণ ছাড়াও নতুন নতুন বস্তু ভাস্কর্যে প্রযুক্ত হল যেমন প্লাস্টিক। কোনও কোনও শিল্পী আবার দর্শককে সজাগভাবে শিল্পকর্মের সঙ্গে যুক্ত করবার অভিপ্রায়ে বিদ্যুৎ বা ইলেকট্রনিকের সাহায্যে সতত পরিবর্তনশীল আলোর কম্পমানতায় ফর্মের মধ্যে সজীবতা ও সচলতার ইল্যুশান আনলেন। এখনকার বিবেচনায় একটি শিল্পবস্তু কোনও নিশ্চল সত্তা নয়। আলো-বাতাস এবং জীবনের কর্মচঞ্চলতার সঙ্গে তা যেন অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। এ-ধরনের বিশ্বাস এবং অভিপ্রায়কে রূপ দিতে গিয়ে ভাস্কর্যের ফর্মের মধ্যে বিস্ময়কর পরিবর্তন এসেছে।[৪২]

ছয়

লেখকের অভিনিবেশের বিস্তৃতি, শিল্পপ্রযুক্তিজ্ঞানের বহুমাত্রিকতা এবং বিশ্বশিল্পের বিচিত্র সংস্কৃতি-সভ্যতার অঙ্গীকারে গ্রন্থের পরবর্তী তিনটি আলোচনা তাৎপর্যপূর্ণ। এশীয় শিল্পকলার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে লেখকের বিবেচনা যুগপৎ অভিজ্ঞতা ও আন্তরিকতায় গৌরবোজ্জ্বল। "চীন ও জাপানের চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি", "ইসলামী শিল্পকলা" ও "ভারতীয় শিল্পকলা" আলোচনাত্রয় একেকটি সংহত অথচ স্বয়ংস্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণতা-জ্ঞাপক বিবেচনা। কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করলে লেখকের অভিনিবেশের গভীরতা ও বিশ্লেষণ-প্রক্রিয়ার স্বাতন্ত্র্য হয়ে উঠবে সুস্পষ্ট:

এক. জাপানী এবং চীনা চিত্রকর্ম মূলতঃ রেখাঙ্কনের একটি ধ্বনি-সাযুজ্য। রেখার আচড়টি শিল্পকর্মের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একেই ইংরেজীতে বলে

লিনিয়ার রিদ্‌ম্ (Linear rhythm)। রেখার সাহায্যে তারা একটি আকৃতির বহির্গঠন যেভাবে নির্মাণ করে পাশ্চাত্য চিত্রশিল্পীরা তা কখনও করে না।[৪৩]

দুই. ইসলামে শিল্পবৃত্তি অন্তরের প্রেরণায় অনুভূতির তাৎপর্যে বাইরের পৃথিবীতে দৃশ্যমানরূপে বিভিন্ন সৃজনশীলতায় চিহ্নিত হয়েছে।[৪৪]

তিন. ভারতীয় হিন্দুরা, তাদের শিল্পকর্মে অলৌকিককে জাগ্রত করতে চেয়েছে। তাদের দৃষ্টিতে পৃথিবীর সবকিছুই তো দেবতা, ভূমিও দেবতা, বৃক্ষও দেবতা, প্রস্তরও দেবতা, নদী মানুষ মেঘ সকলেই দেবতা। সুতরাং এই দেবতার প্রতিকৃতি নির্মাণের জন্য তারা গঠনবৃত্তির যে বৈশিষ্ট্য নির্মাণ করেছে, তা শিল্পজগতে অতুলনীয়।[৪৫]

ভারতীয় শিল্পকলার প্রাথমিক ভিত্তি হচ্ছে বৌদ্ধ শিল্প। লেখক সে-সম্পর্কেও বিশ্লেষণ করেছেন। ভারতীয় শিল্পের সবগুলো আঙ্গিককে স্পর্শ করলেও বিশ শতকীয় ভারত-শিল্পের আলোচনা এতে অন্তর্ভুক্ত হয় নি।

গ্রন্থের অপর আলোচনাটি "অপ্রধান শিল্প"। শিল্পকলার প্রধান ধারার অন্তর্ভুক্ত হলো চিত্রকলা, ভাস্কর্য এবং স্থাপত্য। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য 'প্রয়োজনীয় সামগ্রী যখন শিল্প হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে তখন সেগুলোকে 'অপ্রধান শিল্প'[৪৬] হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এই অপ্রধান শিল্পকর্মের ঐতিহ্যও দীর্ঘকালের। প্রাচীনকালে গ্রীক, জাপান, চীন প্রভৃতি দেশে গৃহসামগ্রীও দর্শনীয় শিল্পকর্ম হিসেবে বিবেচিত হতো। "আধুনিক কালে গৃহসজ্জার সামগ্রী, চেয়ার, টেবিল, বইয়ের শেল্‌ফ, ঘরের পর্দা, কার্পেট সবকিছুই শিল্পপর্যায়ভুক্ত।"[৪৭] জীবনকে সর্বাঙ্গ-সুন্দর করে তুলতে নিত্যব্যবহার্য সামগ্রীকেও সুচারু করে নির্মাণ করতে হয় মানুষকে। কেননা, "মানুষের মৌলিক প্রবৃত্তি হচ্ছে প্রয়োজনের বস্তুকে অনিন্দ্যনীয় করে গড়ে তোলা। এ-স্বভাব সাধারণ মানুষের মধ্যেও যেমন, শিক্ষিত লোকের মধ্যেও তেমনি।"[৪৮] এই প্রয়োজনবোধের ওপর গুরুত্ব আরোপণ আধুনিক শিল্পকলার প্রতিটি আঙ্গিকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। হারবার্ট রীডের ভাষায়: 'Internal necessity' is perhaps the key phrase in the art of our time; but to this internal necessity corresponds an external necessity, which is simply the necessity to communicate with other people with the maximum intensity; and art is the reconcoiliation of these time necessitiesc'। বস্তুতঃপক্ষে প্রধান-অপ্রধান দুটো শিল্পপ্রক্রিয়াই এখন প্রয়োজনের অভিন্ন বিন্দুতে মিলিত হয়েছে। স্থাপত্য যেমন অপ্রধান শিল্পের মতোই আমাদের প্রয়োজনের অনুষঙ্গ, তেমনি চিত্রকলা বা ভাস্কর্যও অভ্যন্তর প্রয়োজনের বিষয়, মানসিক চাহিদার সাথে যার সম্পর্ক সুনিবিড়।

পরিশিষ্ট অংশে অন্তর্ভুক্ত "বাংলাদেশের শিল্পকলা" এবং "আধুনিক শিল্প : কয়েকটি সংজ্ঞা" একদিকে যেমন আমাদের শিল্পচর্চার রূপরেখা নির্মাণের প্রয়াস, অন্যদিকে

তেমনি, আধুনিক শিল্পের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি আন্দোলন সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টির ঐকান্তিকতায় বিশেষত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের শিল্পকলা বিবেচনায় লেখক সংক্ষিপ্ত পরিসরে একটি সামগ্রিক ধারণা উত্থাপনে সক্ষম হয়েছেন—যা সুবিস্তৃত না হলেও ইঙ্গিতময়। কিন্তু বাংলাদেশের শিল্পকলা সম্পর্কে তাঁর অভিনিবেশের গভীরতা ও ব্যাপ্তি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থে পর্যবসিত হওয়ার উপযুক্ত। পক্ষান্তরে, আধুনিক শিল্পের বিশিষ্ট কিছু ধারণাকে সংজ্ঞায়িত করে পাঠকচৈতন্যে তার আবেদন সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিতে অনেকাংশে সক্ষম হয়েছেন তিনি।

অভিজ্ঞতা, অধীত জ্ঞান, জীবন ও শিল্পসম্পর্কে আজীবনব্যাপ্ত সাধনায় সৈয়দ আলী আহসান নিজেই একটি বোধ বা স্বতন্ত্র শিল্পজিজ্ঞাসায় উপনীত। যার ফলে, তাঁর 'শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্য' শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ে আগ্রহী পাঠক, দর্শক ও বিবেচকের কাছে একটি অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হবে নিঃসন্দেহে। মানুষের বিবর্তনশীল জীবন ও শিল্প-অন্বেষার অগ্রযাত্রার পথে এখনও অপেক্ষমান নবতর বাস্তবতার জীবনাবেগ, শিল্পাদর্শ এবং অনুভবের নব নব উদ্ভাবনা। কেননা, "We are always aware of the work of art as agent in the creation of a new and more excitiny reality."[১০]।

রফিকউল্লাহ খান

তথ্যনির্দেশ

১ Virgil C. Aldrich : Philosophy of Art, United States of America, Library of Congress, 1963, p. 29

২ 'Every age has sought to interpret art. Today it is said that art is no longer to be interpreted in the way of which it was in the post.' Arthur R. Howell : The meaning and Purpose of the Art, Ist published 1945, 4th Printing, 1957, The Ditchling Press Limited, Ditchling, Sussex, London, See preface.

৩ Bernard S. Myers : Understanding the Arts (1958), revised edition, printed in the United Sates of America, P. 11

৪ *Ibid*, p. 12

৫ 'শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্য', ভূমিকা, সৈয়দ আলী আহসান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯

৬ Harold Osforne : The Appreciation of the Art/4. Oxford University Press, London, 1970, p. 17

৭ Bernard S. Myers. *Ibid*, p. 4

৮ *Ibid*, p. 9

৯ 'শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্য', ভূমিকা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯

১০ পূর্বোক্ত; পৃ. ১০

১১ পূর্বোক্ত, পৃ. ১০

১২ Quated, Bimal Kumar Datta : Introduction to Indian Art, Calcutta, 1979

১৩ Clive Bell : Enjoying picture (1934), pp. 51-2. Quated, Harold Osforne, *Ibid*, p. 4

১৪ 'শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্য', পূর্বোক্ত, পৃ. ১২

১৫ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭

১৬ পূর্বোক্ত, পৃ. ২২

১৭ Herbert Read : The meaning of Art (1931), Penguin Books, Faber and Faber, 1967, p. 51

১৮ 'শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্য', পূর্বোক্ত, পৃ. ২২

১৯ 'প্রাগৈতিহাসিক যুগের শিল্পচৈতন্য', 'শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্য', পৃ. ২৬

২০ Herbert Read, *Ibid*, p. 57

২১ 'প্রাগৈতিহাসিক যুগের শিল্পচৈতন্য', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬-২৮

২২ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২

২৩ 'শিল্পকর্মে দৃষ্টিচেতনা', পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮

২৪ Herbert Read : Art Now (1933), Revised edition 1968, Faber and Faber Limited, London, P. 56

২৫ Herbert Read, The meaning of Art, *Ibid*, 'All art is primarily abstract', P. 33

২৬ *Ibid*, 'Art is an escape from chaos', P. 33

২৭ 'বিমূর্ত শিল্পকর্ম', 'শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্য', পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২

২৮ 'শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্য', ভূমিকা, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০

২৯ 'বিমূর্ত শিল্পকর্ম', পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১

৩০ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২

৩১ Herbert Read, The meaning of Art, *Ibid*, P. 186

৩২ বিমূর্ত শিল্পকর্ম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩

৩৩ Herbert Read, Art Now, *Ibid*, P. 83

৩৪ 'বিমূর্ত শিল্পকর্ম', পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪

৩৫ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬

৩৬ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪

৩৭ Bernard S. Myers : *Ibid*, . . .Perhaps the most important aspect of Painting color can impart many things.' See pp. 161-62

৩৮ 'চিত্রকর্মে রং-এর ব্যঞ্জনা এবং রসপ্রতিপত্তি', 'শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্য', পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২

৩৯ 'বিহ্বাদ', পূর্বোক্ত, পৃ. ৮১

৪০ Bernard S. Myers. *Ibid*, P. 86
৪১ 'স্থাপত্যশিল্প', 'শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্য', পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯
৪২ 'ভাস্কর্য', পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৪
৪৩ 'চীন ও জাপানের চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি', পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৮
৪৪ 'ইসলামী শিল্পকলা', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪১
৪৫ 'ভারতীয়' শিল্পকলা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৩-৪৪
৪৬ 'অপ্রধান শিল্প', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৯
৪৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫২
৪৮ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫২
৪৯ Herbert Read : Art Now, *Ibid*, p. 120
৫০ Bernard S. Myers. *Ibid*, P. 67